সংবাদ

তারিখ 18 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সরকারি ব্যয়ের সামান্যই শিক্ষার্থীরা ভোগ করে

মো. রফিকুল ইসলাম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো এমন একটি জায়গা যেখানে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্তরের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কলেজ) ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। উল্লেখিত সম্পূর্ণ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কলেজ) ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রয়েছে। সম্প্রতি বেসরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সাধারণভাবে ধারণা রয়েছে যে, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এসব বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান খুবই ব্যয়বহুল। এগুলোতে ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন অনেক বেশি। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, সম্পূর্ণ সরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন তুলনামূলকভাবে কম হলেও বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে ধার্যকৃত অন্যান্য ফির পরিমাণ কম নয়। এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন সরকারি প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অনেক বেশি। এমন কি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অনেক প্রতিষ্ঠানের ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন অপেক্ষাও বেশি। ঢাকায় অনেক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের ভর্তি ফি ১০০০০-২০০০০ টাকা এবং মাসিক বেতন ১০০০-২০০০ টাকা। বর্তমানে সরকারি ও এমপিওভুক্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কোচিংকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ৫ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ শ্রেণীর প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কোচিং বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সাধারণত স্কুল শুরুর পূর্বে বা স্কুল ছুটির পর এ কোচিং করানো হয়। স্কুল ভেদে কোচিং ফির পরিমাণ ৮০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা। শিক্ষার্থীরা কোচিং না করলেও তারা এ কোচিং ফি দিতে বাধ্য হয়। তাছাড়াও রয়েছে শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছায় প্রাইভেট পড়া বা কোচিং এ যাওয়া।

সম্প্রতি সহযোগী একটি দৈনিকে 'তবুও প্রাইভেট, তবুও কোচিং' শিরোনামে প্রাইভেট পড়া ও শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে যাওয়ার বিষয়ে একটি সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদক ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ ও ঠাকুরগাঁও সরকারি বিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রতিবেদক ঠাকুরগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ, কতিপয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলেছেন। শিক্ষার্থীরা বলেছেন, 'নিয়মিত ক্লাসে আসা হয় না, ক্লাসই ঠিকমতো হয় না, টিচাররা ক্লাসে আসে না, টিচাররা আসে, আমরা আসি না।' ঠিকমতো ক্লাস না হলেও, শিক্ষার্থী/শিক্ষকরা ক্লাসে না এলেও শিক্ষার্থীদের সবাই নিয়মিত প্রাইভেট পড়েন। কলেজ চলাকালীন সময়ে ভরদুপুরেও কলেজ ভবনেই শিক্ষার্থীরা কলেজ শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ছেন। কলেজে ক্লাস না হওয়া, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ক্লাসে না আসা ও প্রাইভেট পড়ার বিষয়ে প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে অধ্যক্ষ ও কলেজ শিক্ষকরা অভিযোগ স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন যে, এ চিত্র শুধু ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের নয়, সারা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চিত্রই এ রকমের। অধিকন্তু তারা জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। ঠাকরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজের চিত্রও একই রকম। এ বিষয়ে একজন শিক্ষক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন যে, লেখাপড়া কিছুই হচ্ছে না। তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, এটা শুধু এ কলেজের নয়, সারা দেশের বাস্তবতা একই রকম। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ হাজার। আমরা জানি না, উল্লেখিতসংখ্যক শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ৬টি পিরিয়ড ক্লাস করানোর মতো শিক্ষক, ক্লাসরুমসহ পরীক্ষাগার, লাইব্রেরি ইত্যাদি উক্ত কলেজে আছে কিনা। সম্ভবত নেই। এরূপ অবকাঠামোগত আবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব সারা দেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে।

ঠাকুরগাঁও সরকারি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিবেদকের আলাপ হয়েছে। তারা স্বীকার করেন যে, তারা প্রত্যেকেই ক্লাসের পাশাপাশি অন্তত ৪-৫টি বিষয়ে প্রাইভেট পড়েন বা কোচিং করেন। ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিবেদক আলাপ করেছেন। সেখানে ক্লাস হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৪-৫টি করে বিষয়ে প্রাইভেট পড়ছেন/কোচিং সেন্টারে যাচ্ছেন।

ঠাকুরগাঁওয়ের আলোচ্য সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের মতো আমরাও মনে করি স্নাতক পর্যায়ের প্রায় সব সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস হয় না, শিক্ষকরা ক্লাসে যায় না ও পড়ায় না। শিক্ষার্থীরাও ক্লাসে আসে না, পড়েন না। প্রাইভেট/কোচিংই তাদের একমাত্র ভরসা। ঠাকুরগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মতো সারা দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণের সবাই অন্তত ৪-৫টি করে বিষয়ে প্রাইভেট পড়ে/কোচিংয়ে যাঁয়। অনেকেই পাঠ্য সব বিষয়েই প্রাইভেট পড়ে বা কোচিং এ যায়।

আমরা সবাই জানি যে, প্রাইভেট পড়া এবং কোচিংয়ের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাও আবার অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। প্রাইভেট পড়ার ফি বেশি। কোচিংয়ের ফি সে তুলনায় কম। শিক্ষার্থীদের এ প্রাইভেট পড়া ও কোচিং করা শুধু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সীমিত নয়। ১ম শ্রেণী থেকেই শুরু হয়ে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত এর মাত্রা কিছুটা কম থাকলেও ৮ম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত তা চলে ব্যাপকভাবে। প্রাইভেট/কোচিং পড়া হয় বিষয়ভিত্তিক। অর্থাৎ, প্রতি বিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে প্রাইভেট/কোচিং পড়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি মাসে প্রাইভেট পড়া ও প্রাইভেট কোচিং এবং স্কুল কোচিং বাবদ অন্তত ১০-১২ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। প্রাইভেট পড়েনা বা কোচিং এ যায় না- এমন কোন শিক্ষার্থী সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। এতে দেখা যাচ্ছে যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও শিক্ষা খাতে শিক্ষার্থীদের ব্যয়ের কোন কমতি নেই। শুধু ওই প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি কম। যা তাদের মোট শিক্ষা ব্যয়ের এক দশমাংশও হয় না। অনেক পাঠক উপরোক্ত তথ্য ও মতামতকে অতিরঞ্জিত মনে করতে পারেন। কিন্তু ভুক্তভোগী অর্থাৎ শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের কাছে তা বাস্তব বলেই মনে হবে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের উপরোক্ত শিক্ষা ব্যয় অভিভাবকদের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। সাধারণ অভিভাবকরা এ পাথর বহন করতেও পারছে না; সরাতেও পারছে না। অত্যাচার সহ্য করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রশ্ন আসতে পারে, কেন এ প্রাইভেট পড়া ও কোচিং করা? বিভিন্ন জন এজন্য ভিন্ন ভিন্ন কারণ উল্লেখ করতে পারেন। আমাদের বিবেচনা নিম্নোক্ত কারণে সর্বগ্রাসী এ ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের ওপর চেপে বসেছে–

ক) শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত ও মানসম্মত পড়াশোনা না হওয়া : ইতিপূর্বে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অ্যাসেম্বলির সময় বাদ দিয়ে ৬ ঘণ্টা শিক্ষা সময় ছিল। উক্ত ৬ ঘণ্টার মধ্যে (৩০) ত্রিশ মিনিট টিফিন পিরিয়ড ছিল। অবশিষ্ট ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ক্লাস হতো। বর্তমানে প্রতিটি সরকারি ও ভালো ভালো এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রভাতী ও দিবা শাখা নামে দুটি শিফট চালু রয়েছে। কাগজপত্রে প্রতিষ্ঠানের সময়সূচি যাই উল্লেখ করা থাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে বাস্তব কারণে কোন প্রতিষ্ঠানেই ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের বেশি সময় পাঠদান সম্ভব হয় না। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রতিদিন ৬-৭ পিরিয়ড পড়াতে হয়। কাজেই কোন পিরিয়ডেই ৩০ মিনিটের বেশি সময় বরাদ্দ সম্ভব হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক পাঠদানের জন্য উক্ত সময়টি খুবই অপর্যাপ্ত। তাছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ছুটির পরিমাণ অনেক বেশি। অধিকন্তু পিএসসি/ জেএসসি/ এসএসসি/ এইচএসসি পরীক্ষার সময়ও বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকে। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের সময় ও কার্যদিবসের সংখ্যা খুব কম। আমরা মনে করি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুই শিফট চালুর কারণে পাঠদানের সময় অনেক কমে গেছে যা শিক্ষার জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়েছে।

খ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত–

প্রতিটি সরকারি ও তথাকথিত ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শ্রেণী ও শাখায় শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি। ক্ষেত্র-ভেদে একটি শাখায় ৮০-১২০ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করেন। এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ৩০ মিনিট সময়ের ক্লাসে পড়ানো সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে স্থান সংকুলানের অভাবে সব শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে ভালোভাবে বসতেও পারে না। শিক্ষকের বক্তব্য সব শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছায় না। ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে মনোযোগী হয় না। শিক্ষকরাও পঠিত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে পারে না। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করে। ক্লাস নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। ফলে শিক্ষকরা কক্ষের আয়তন, শিক্ষার্থীর কলরব ইত্যাদির কারণে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেন। এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষকরা বুঝে যান যে, ক্লাসে পড়ানো সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা বুঝে ফেলে যে ক্লাসের পড়ায় তাদের চলবে না। প্রাইভেট পড়তে হবে বা কোচিংয়ে যেতে হবে।

গ) শিক্ষকের অর্থ আয়ের আশঙ্কা–

সব শিক্ষক না হলেও অধিকাংশ শিক্ষকই অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াতে বা কোচিং করাতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। সেজন্য তারা ক্লাসে পাঠদানের বিদ্যমান স্বল্প সময় ও অপর্যাপ্ত সুযোগগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই কাজে লাগান না। ক্লাসে সঠিকভাবে পাঠ্য বিষয়টি বোঝানোর পরিবর্তে বিভিন্ন গল্পগুজব করে ক্লাসের সময় পার করে দেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়তে বা কোচিংয়ে যেতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করেন।

ঘ) প্রাইভেট পড়লে বা কোচিংয়ে গেলে পরীক্ষার ফল তুলনামূলকভাবে ভালো হয়–

প্রথমত, প্রাইভেট বা কোচিং শিক্ষক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ও ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করে আগত পরীক্ষায় কোন কোন অধ্যায় থেকে কি কি প্রশ্ন হতে পারে, সে সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারেন। আন্দাজের ভিত্তিতে তারা প্রতিটি বিষয়েই আগত পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো নির্বাচন করে সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে পড়ান। অন্যান্য অধ্যায়গুলো পড়ান না বা পড়ালেও গুরুত্বহীনভাবে পড়ান। পরীক্ষার পূর্বে একটি ফাইনাল সাজেশন দেন। যার অধিকাংশই পরীক্ষায় কমন পাওয়া যায়। এভাবে কম পড়েও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা যায়। বাংলাদেশে রেজাল্টসর্বস্ব পড়াশোনার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবাই পরীক্ষার ফল ভালো চায়। পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফল নিশ্চিত করতে হলে পরীক্ষার হলে শিক্ষকের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, বিশেষত যাদের পরীক্ষার ফলাফল খুব ভালো, তারা পরীক্ষার দিন ওই বিষয়ের শিক্ষককে পরীক্ষার হলে প্রেরণ করেন। প্রেরিত শিক্ষক পরীক্ষার হলে তার কাছে প্রাইভেট পড়া/কোচিং করা শিক্ষার্থীকে বেশি সহযোগিতা করে। ওই শিক্ষক নিজে পরীক্ষার হলে যেতে না পারলেও পরীক্ষার হলে দায়িত্বপালনকারী অন্য শিক্ষককে দিয়ে তার কাছে প্রাইভেট পড়া শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করে থাকেন। পরীক্ষার হলে অনুরূপ সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখেও শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট পড়ে/কোচিংয়ে গিয়ে থাকে।

ঙ) উপরোক্ত বাস্তব কারণ ও সুবিধা ছাড়াও প্রাইভেট পড়া বা কোচিং করার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি নেশার মতো হয়ে গেছে। একজনের প্রভাবে অন্যজন তা করে। বন্ধু বান্ধব/বান্ধবী একসঙ্গে যায়, দেখা করে, গল্প-গুজব করে, চা-নাস্তা খেতে পারে। শিক্ষকরা হাসিখুশিভাবে পড়ান। সামগ্রিকভাবে প্রাইভেট পড়া/কোচিংয়ের সময়টি আনন্দময় হয়। বাড়িতে একা একা নিরানন্দ পরিবেশে চেয়ে প্রাইভেট/ কোচিংয়ের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের বেশি টানে। কাজেই নেশাগ্রস্তের মতো শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট/কোচিংয়ে যায়। সন্তানের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে পরীক্ষায় ভালো ফল করার নেশায় অভিভাবকদের প্রাইভেট/কোচিংয়ে পাঠায়।

নির্বাচিত অধ্যায়গুলো পড়া ও পরীক্ষার হলে শিক্ষকের সহযোগিতার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর নিজের অর্জিত যোগ্যতা অপেক্ষা পরীক্ষার ফল ভালো হয়। এসব শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভালো ফল করলেও পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। এতে তারা একদিকে শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে অভিভাবকদের আর্থিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অন্যদিকে এইচএসসি উত্তর শিক্ষা স্তরে ভর্তি ও কর্ম জীবনে ব্যর্থতায় নিজেদের ও অভিভাবকদেরকে হতাশাগ্রস্ত করে। শিক্ষা খাতে সরকারের বিপুল ব্যয়ের সুফল শিক্ষার্থীরা পায় না।

আমরা বলতে চাই যে, বাংলাদেশের শিক্ষায় প্রাইভেট পড়া বা কোচিং একটি মারাত্মক ব্যাধি। এ কারণে ক্রমে ক্রমে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। অবিলম্বে তা বন্ধ হওয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্ম দিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় বৃদ্ধি, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত করা, প্রশ্ন প্রণয়নে আধুনিকতা অর্থাৎ নির্বাচিত অধ্যায় ও সাজেশনকে অকার্যকরণ করা, পাবলিক পরীক্ষার হলে শিক্ষকদের ঢুকতে না দেয়া, পাবলিক পরীক্ষার হলে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করে হল পর্যবেক্ষণ করা, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলকে পরবর্তী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি/চাকরির জন্য বিবেচনায় না আনা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকর করা গেলে বাংলাদেশে প্রাইভেট পড়া/কোচিং বন্ধ হতে পারে। প্রাইভেট পড়া/কোচিং বন্ধ হলে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অর্থ ব্যয় করতে হবে না সরকারি ব্যয়েই তাদের শিক্ষা হবে।

লেখক : প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, রফিকুল ইসলাম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নিউ টাউন, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা